‘বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি’ ঃ একটি পর্যালোচনা

শাহ্ আবদুল হালিম

দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ এপ্রিল, ২০০৫ সংখ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক প্রফেসর ড. আবুল বারকাতের নিবন্ধ ‘বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি’র ওপর আলোচনা দেখে নিবন্ধটির মূল ভাষ্য পাঠ করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ জাগে। ‘ইন্সটিটিউট ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নাজমুল হক রবিকে ধন্যবাদ নিবন্ধটি পড়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে আমরা স্বাভাবিকভাবেই সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত, ভবিষ্যতেও দেখতে চাই। কিন্তু কোনো ‘বিশিষ্ট’ শিক্ষক যখন বস্তুনিষ্ঠতার পরিবর্তে প্রচারণার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তখন স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। যে কোনো বিষয় বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন, একটি মৌলিক শর্ত ঃ নৈর্ব্যক্তিক (অবজেকটিভ) দৃষ্টিভঙ্গি। প্রফেসর ড. আবুল বারকাত তার নিবন্ধ ‘বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি’তে সে মনোদৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করতে সক্ষম হননি। বরং নিজেই একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সমর্থন করে পুরো নিবন্ধটি রচনা করেছেন।

ড. আবুল বারকাত তার নিবন্ধে ইসলামী জীবনাদর্শের সাথে পার্থিব বস্তুবাদের মৌলিক পার্থক্য একাকার করে ফেলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ ‘তারা [মৌলবাদীরা] স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে সম্ভাব্য উচ্চ মুনাফা অর্জনের খাতসমূহে বিনিয়োগ করেছে। অর্থাৎ পারলৌকিক জীবন নিয়ে লৌকিকতায় তারা যতই পারদর্শিতা প্রদর্শন করুক না কেন, ইহলৌকিক-পার্থিব জীবন সম্পর্কে তারা অনেকের চেয়ে অধিকতর সজাগ-সচেতন’ [প্রফেসর ড. আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি, এপ্রিল ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৯-২০]।

এ কথার সত্যতা নিয়ে কথা না বলে শুধু এটুকু বলতে চাই, মুসলিম দর্শন, জীবনাচার সম্বন্ধে ড. আবুল বারকাতের স্পষ্ট ধারণা থাকলে তিনি অবশ্যই এ ধরনের মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করতেন। প্রতিদিন আমরা প্রার্থনা জানাই ঃ ‘হে প্রভু! আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দাও ‘রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনিয়া হাসনাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসনাতাও’ [সূরা আল বাকারা ঃ ২০১]। মুসলিম ধর্মবিশ্বাসে পরকালকে গৌণ করা হয়নি। একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব জীবন পরকালের সৌভাগ্যের সোপান।

ড. আবুল বারকাতকে ধন্যবাদ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের জন্য বিশেষ করে প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের ‘প্রকৃত অর্থে অঙ্গীকার, আর বাস্তবতার ফারাক’ এ মন্তব্যের জন্য (পৃষ্ঠা ৯)। এ সময়ে দারিদ্র্য বেড়েছে। তার ভাষায় ঃ ‘গত ৩৩ বছরে কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিঃস্ব হয়েছেন; সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুশ বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি। সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে; বেড়েছে বৈদেশিক খবরদারি, কমেছে দেশজ-স্থানীয় উদ্যোগ; বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সাথে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনী ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; বেড়েছে কালো টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ। বেড়েছে শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, কমেছে মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ; বেড়েছে দারিদ্র্য-উদ্ভূত অসুখ-বিসুখ এবং চিকিৎসা ব্যয় উদ্ভূত নিঃস্বায়ন, কমেছে সরকারি স্বাস্থ্যখাতের কার্যকারিতা” (পৃষ্ঠা ১২)।

‘গত ৩৩ বছরের বিকাশের ধারা ১৪ কোটি মানুষের আমাদের দেশকে সুস্পষ্টভাবে দু’ভাগে বিভাজিত করেছে ঃ প্রথম ভাগে আছেন সংখ্যালঘু ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ১০ লাখ... এমন এক অবস্থা যেখানে ১০ লাখ ক্ষমতাধরের বিপরীতে আছেন ১৩ কোটি ৯০ লাখ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত বঞ্চিত মানুষ’ (পৃষ্ঠা-১০)। এ অবস্থার জন্য লেখক দায়ী করেছেন ‘অর্থনীতি, রাজনীতি আর শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসহ সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি [কে, যা] জেঁকে বসেছে’ (পৃষ্ঠা-১০)। তার ভাষায় ঃ ‘এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির

চরিত্র নিয়ামক হলো কালো টাকা, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশীশক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-পীড়ন ইত্যাদি' (পৃষ্ঠা-১০)।

ড. আবুল বারকাত যথার্থই বলেছেন ঃ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক শক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি' (পৃষ্ঠা-১৩)। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কারা এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাদের জন্য জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি। এ সময় কারা ক্ষমতায় ছিল? এ দীর্ঘ সময়ে যারা ক্ষমতায় ছিল, তারা এক সময়ের সেক্যুলার, বাম বা প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক।

মৌলবাদের আলোচনায় এসে তিনি ৮টি খাতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এসব প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে মৌলবাদী রাজনৈতিক দল পরিচালনার অর্থ যোগান দেয়া হয়। তার ভাষায় ঃ 'মুনাফার একাংশ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে' ব্যয় করেছে (পৃষ্ঠা-১৭)। এরপরও তিনি বলেছেন ঃ 'অনেকেই মনে করেন যে, দেশে সশস্ত্র জঙ্গি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনে সমুদয় অর্থ বিদেশ থেকেই পেয়ে থাকে' (পৃষ্ঠা-১৭)। '৭০-৮০'র দশকে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ সরবরাহ পেয়েছে' (পৃষ্ঠা-১৭)। যদিও তিনি এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ বা দলিল উপস্থাপনা করেননি। এরকম ঢালাও মন্তব্য কতটা একাডেমিক তা বলাই বাহুল্য।

ড. আবুল বারকাত বাংলাদেশে মৌলবাদী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি ব্যালেন্স শিট উপস্থাপনা করেছেন। তার মতে, 'বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির এখন বার্ষিক নিট মুনাফা আনুমানিক ১২০০ কোটি টাকা' (পৃষ্ঠা-১৭)। তিনি ১২০০ কোটি টাকার একটি ব্রেকআপ দিয়েছেন। তা এরূপ ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানি থেকে অর্জিত হয় ২৭ শতাংশ, বেসরকারি সংস্থা থেকে আসে ২০.৮ শতাংশ, বাণিজিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৮ শতাংশ, ওষুধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্যসেবা খাত থেকে আসে ১০.৪ শতাংশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৯.২ শতাংশ, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় থেকে আসে ৮.৩ শতাংশ, যোগাযোগ ব্যবসায় থেকে আসে ৭.৫ শতাংশ, সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য-প্রযুক্তি থেকে আসে ৫.৮ শতাংশ (পৃষ্ঠা ১৭-১৮)। নিট মুনাফার এ শতাংশ হার তার ভাষায় 'প্যাটার্ন' 'অনুমাননির্ভর' (পৃষ্ঠা-১৮)।

তাঁর দেয়া সব তথ্য ও পরিসংখ্যান কোনোভাবেই বাস্তব অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং তা সম্পূর্ণ কল্পনানির্ভর। তার দাবির অসারতা প্রমাণ করার জন্য আমরা তার দুয়েকটি দাবির পর্যালোচনা করব। তিনি দাবি করেছেন, ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বীমা ও ইসলামী লিজিং কোম্পানির নিট মুনাফা হচ্ছে ৩২৫ কোটি টাকা (১২০০ কোটি টাকার ২৭ শতাংশ) (পৃষ্ঠা-১৮)। তার এ দাবি একেবারেই সঠিক নয়। বিষয়টি একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখা যাক। বাংলাদেশে এ মুহূর্তে ছয়টি ইসলামী ব্যাংক, পাঁচটি ইসলামী বীমা কোম্পানি ও একটি ইসলামী লিজিং কোম্পানি রয়েছে। এর মধ্যে একটি ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের মধ্যে রয়েছে প্রগতিশীল ও সেক্যুলার ঘরানার ব্যবসায়ীরা। তারা কেউ মৌলবাদী নন বরং মৌলবাদ বিরোধী হিসেবে সমাজে সুপরিচিত।

পাঁচটি ইসলামী বীমা কোম্পানির মধ্যে শুধু একটি ইসলামী বীমা কোম্পানি ব্যবসায় সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাবলিক শেয়ার ইস্যু করেছে। এই ইসলামী বীমা কোম্পানিটি ২০০৪ সালে আয়কর ও অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বাবদ ১৫ কোটি ৭৬ লাখ টাকা বাদ দেয়ার পর ৯০ লাখ টাকা শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বিতরণ করেছে। অন্য চারটি ইসলামী বীমা কোম্পানি ২০০৪ সালে যে নিট আয় ছিল, তা থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বাবদ ২ কোটি ৬৪ লাখ টাকা রাখার পর করযোগ্য আয় হয়নি বা লভ্যাংশ দেয়ার মতো কোনো টাকা ছিল না।

একমাত্র লিজিং কোম্পানিটি এখন পর্যন্ত ব্যবসায় সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাবলিক শেয়ার ইস্যু করেনি। এই লিজিং কোম্পানিটি আয়কর ও অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বাবদ ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা বাদ দিয়ে লভ্যাংশ হচ্ছে ১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা, যার সমপরিমাণ বোনাস শেয়ার ইস্যুর সংস্থান করেছে। অর্থাৎ এই ইসলামী লিজিং কোম্পানির মালিকরা ২০০৪ সালে কোনো নগদ লভ্যাংশ পায়নি।

ছয়টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে প্রগতিশীল ঘরানা ও মৌলবাদবিরোধী ইসলামী ব্যাংকটি বাদ দিলে থাকে পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক। এ পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক ৪৫ শতাংশ আয়কর ও অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বাবদ ১১৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা বাদ দিয়ে লভ্যাংশ হিসেবে ৭০ কোটি ৪৫ লাখ টাকা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করেছে ২০০৩ সালে। ওই সময় একটি ইসলামী ব্যাংকের নিট লোকসানের পরিমাণ ৩৯ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। স্মরণ রাখা দরকার, যে ইসলামী ব্যাংকটি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার বর্তমান ব্রাঞ্চ সংখ্যা ১৫১, এর মালিকানায় রয়েছে ৫৮ শতাংশ বিদেশী, যার অন্যতম হচ্ছে জেদ্দাভিত্তিক ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি)।

তাহলে কি দাঁড়াল? ইসলামী বীমা কোম্পানি থেকে লভ্যাংশ হচ্ছে ৯০ লাখ টাকা। আর ইসলামী ব্যাংকসমূহের দেয় লভ্যাংশ হচ্ছে ৭০ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। ইসলামী লিজিং কোম্পানি থেকে লভ্যাংশ হচ্ছে ১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা, যার সমপরিমাণ বোনাস শেয়ার ইস্যুর সংস্থান কোম্পানি করেছে। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বীমা ও ইসলামী লিজিং কোম্পানির নিট আয় (সরকারকে দেয়া আয়কর ও অন্যান্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বাদ দিয়ে) যা শেয়ারহোল্ডারদের হাতে গেছে, তা হচ্ছে ৭২ কোটি ৮২ লাখ টাকা। অথচ ড. আবুল বারকাত তার নিবন্ধে দাবি করেছেন, ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বীমা ও ইসলামী লিজিং কোম্পানির নিট আয় ৩২৫ কোটি টাকা। আর তার ভাষায় এটাই মৌলবাদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিট আয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো টাকা কি কোনোভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে হস্তান্তরের সুযোগ আছে? ড. আবুল বারকাতের অবশ্যই জানা আছে, এসব প্রতিষ্ঠান বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত। যেমন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্ট ১৯৯১। সব ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে হয় এবং যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাজারে কেনাবেচা হয় তাদের সিক্যুরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিয়মাবলীও মেনে চলতে হয়। সেই সাথে চট্টগ্রাম ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্চ কমিশনের নিয়মাবলীও মেনে কাজ করতে হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করা হয়। অধিকন্তু, লভ্যাংশ ও অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনও বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনোভাবেই হিসাবের বাইরে কোনো টাকা কোথাও ট্রান্সফার বা সরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

ড. আবুল বারকাত দাবি করেছেন, মৌলবাদী বেসরকারি সংস্থা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিট মুনাফা ৩৮০ কোটি টাকা (১২০০ কোটি টাকার ৩১.৬ শতাংশ। যথাক্রমে ২০.৮ শতাংশ+১০.৮ শতাংশ) (পৃষ্ঠা-১৮)। পাঠকদের ধাঁধার মধ্যে রাখার জন্য তিনি অবশ্য ব্যাখ্যা করেননি, বেসরকারি সংস্থা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বলতে তিনি নির্দিষ্ট কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়েছেন। বস্তুনিষ্ঠ গবেষক হিসেবে তার উচিত ছিল এসব প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা দেয়া। কিন্তু তিনি তা সম্ভবত ইচ্ছা করেই দেননি।

ড. আবুল বারকাত আরো দাবি করেছেন, ওষুধ শিল্প ও ডায়গনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্যসেবা খাত থেকে নিট মুনাফা ১২৫ কোটি টাকা (১২০০ কোটি টাকার ১০.৪ শতাংশ) (পৃষ্ঠা-১৮)। শফিপুরের ওষুধ কারখানাটির ২০০৪ সালে আয়কর দেয়ার পর বার্ষিক আয় ২ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। এ লভ্যাংশ দশ হাজার শেয়ার মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একই গ্রুপের ধানমন্ডির ক্লিনিকটি একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান। ২০০৪ সালে বার্ষিক আয় আয়কর দেয়ার পর ৪ কোটি ১০ লাখ টাকা। এরকম যদি আরও কিছু প্রতিষ্ঠান থেকেও থাকে, তাহলেও এ খাত থেকে নিট মুনাফা ১২৫ কোটি টাকা এ পরিসখ্যানে উপনীত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, ড. বারকাতের দাবি ওষুধ শিল্প ও ডায়গনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্যখাত থেকে মৌলবাদী অর্থনীতি ১২৫ কোটি টাকা আয় করে এ একটি উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত দাবি যার সাথে সত্যের কোনো সংস্পর্শ নেই।

ড. আবুল বারকাত দাবি করেছেন, মৌলবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিট মুনাফা ১১০ কোটি টাকা (১২০০ কোটি টাকার ৯.২ শতাংশ) (পৃষ্ঠা-১৮)। এ একটি অবাস্তব প্রস্তাবনা, একবারেই অসম্ভব। দেশের মাদ্রাসাগুলো প্রধানত চলে জাকাত, সাদকা, দান-খয়রাতের ওপর নির্ভর করে। এটা সবারই জানা। ১১০ কোটি টাকার হিসাব ড. বারকাত কিসের ভিত্তিতে তৈরি করেছেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। যে গুটি কয়েক স্যুল, কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি খাতে দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা সবই ট্রাস্ট পরিচালনাধীন। যে কারণে এর লভ্যাংশ কোনো ব্যক্তি নিতে পারেন না এবং দেশের আইনে তার অনুমতি নেই।

ড. আবুল বারকাত দাবি করেছেন, মৌলবাদী সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য-প্রযুক্তি খাত থেকে নিট মুনাফা হচ্ছে ৭০ কোটি টাকা (১২০০ কোটি টাকার ৫.৮ শতাংশ) (পৃষ্ঠা-১৮)। মগবাজার থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাটি কোনো সময়ই লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং এমন সময়ও গেছে যখন এ পত্রিকার সাংবাদিক-কর্মচারীরা একাধারে এগারো মাস বেতন-ভাতা পাননি। ইসলামী সমাজ পুনর্গঠনে বিশ্বাসী মহলের একটি দৈনিক পত্রিকাই সম্ভবত সফলভাবে চালু আছে। সেই সাথে মৌলবাদীদের কোনো সংবাদ সংস্থা ও কোনো প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল নেই। ড. আবুল বারকাত সংবাদ মাধ্যম ও প্রযুক্তি খাত থেকে মৌলবাদীদের বার্ষিক নিট আয় ৭০ কোটি টাকা এই হিসাবে কিভাবে পৌঁছলেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। তিনি এর ব্যাখ্যা দেননি।

ড. আবুল বারকাতের দাবি মৌলবাদী অর্থনীতি রিয়েল এস্টেট ও যোগাযোগ খাত থেকে নিট মুনাফা ১৯০ কোটি টাকা (১২০০ কোটি টাকার ১৫.৮ শতাংশ। যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ+৭.৫ শতাংশ) (পৃষ্ঠা-১৮)। মৌলবাদীরা কোনো কোনো রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ও ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত, তিনি তার উল্লেখ করেননি। কিন্তু এ খাতে ১৯০ কোটি টাকার যে আয়ের কথা নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইতঃপূর্বে আলোচিত অন্যান্য খাতের মতোই কল্পনাপ্রসূত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ড. আবুল বারকাত দাবি করেছেন, মৌলবাদী অর্থনীতির বার্ষিক নিট মুনাফা ১২০০ কোটি টাকার 'মাত্র দশ শতাংশ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করে ৫ লাখ দলীয় সদস্য পূর্ণকালীন নিযুক্তি দেয়া সম্ভব। তারা সেটা করেন এবং অন্যান্য খাতে ক্রস-ভর্তুকি দেন' (পৃষ্ঠা-২০)।

বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা যাক। ১২০০ কোটি টাকার ১০ শতাংশ হচ্ছে ১২০ কোটি টাকা, যা দিয়ে মৌলবাদীগোষ্ঠী ৫ লাখ দলীয় সদস্য পূর্ণকালীন নিযুক্তি দেন। তাতে কি দাঁড়াল? এর অর্থ হচ্ছে একজন দলীয় সদস্য 'পূর্ণকালীন' নিযুক্তির বিনিময়ে তাকে দেয়া হবে বার্ষিক ২৪০০ টাকা। অর্থাৎ মাসিক ২০০ টাকা। এ ধরনের বেতন কাঠামো কতদূর যৌক্তিক এবং তা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কতটুকু প্রতিফলন করে তা প্রফেসর ড. আবুল বারকাতই ভালো বলতে পারবেন। অন্যান্য খাতে ক্রস-ভর্তুকি দিলে দলীয় সদস্যদের পূর্ণকালীন নিযুক্তির জন্য ১২০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে একজন দলীয় সদস্যকে 'পূর্ণকালীন' নিযুক্তির জন্য এমনকি মাসিক ২০০ টাকা পাওয়া যাবে না।

বলতে বাধ্য হচ্ছি, বস্তুত প্রফেসর ড. আবুল বারকাতের নিবন্ধটি একটি আষাঢ়ে গল্প বৈ কিছু নয়। এটি কোনো গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণমূলক অর্থনৈতিক নিবন্ধ হয়নি। এ নিবন্ধের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, এ অভিযোগ তিনি এড়াতে পারবেন না।

লেখক ঃ গবেষক, রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও চেয়ারম্যান ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো বাংলাদেশ। ই-মেইল ঃ sah1947@yahoo.com, ওয়েব সাইট ঃ geocities.com/sah1947

Source: http://www.nayadiganta.com/2005/08/07/up_editorial.htm